

পবিত্র সরকার

১৫
১৮
১৯

আবার সে এসেছে ফিরে



ভারতের
পশ্চিমবঙ্গের
রাজ্য সরকারের
শিক্ষা বিভাগ
প্রথম থেকে
অষ্টম শ্রেণী
পর্যন্ত পরীক্ষা-

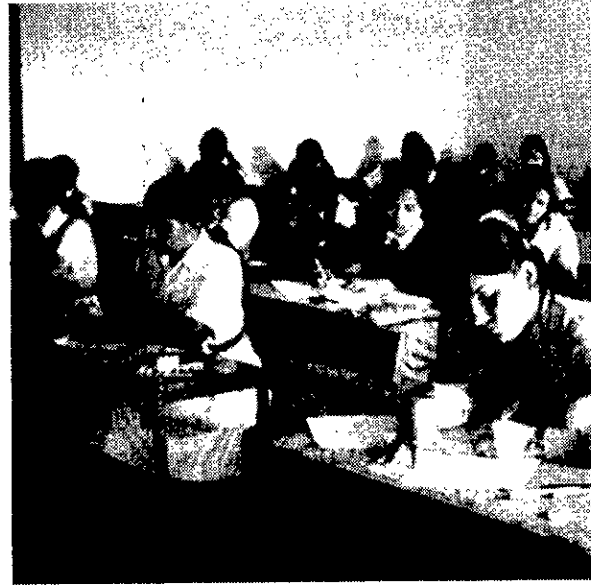
প্রণালী ফিরিয়ে আনতে রাজি হয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থা মানে ক্লাসের শেষে একটা বার্ষিক ঝাড়াই-বাছাইয়ের পরীক্ষা হবে, আগে যেমন হতো। তাতে পাস করলে কিছু ছেলেমেয়ে উপরের ক্লাসে উঠত, নতুন বইয়ের গন্ধ শোকার সুযোগ পেত, প্রথম দিকের ছেলেমেয়েদের বাড়িতে অবস্থা বা ব্যবস্থা থাকলে একদিন ভালো খাওয়া-দাওয়া হতো। তাদের পরিচয় হতো ফাস্ট/সেকেন্ড/থার্ড বয়/গার্ল হিসেবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ নজরে থাকত তারা। আর যারা উনবাটম বা একাত্তরতম হয়েছিল, তাঁদের অভিভাবকরা হয়তো ছেলেমেয়েকে বলতেন, 'তোদের ফাস্ট/সেকেন্ড বয়/গার্ল কে রে? দেখিয়ে দে তো!'

এ ব্যবস্থাই তথাকথিত 'পাস-ফেল' প্রথা। নাটো ভালো নয়, কারণ এতে ফেল করার দায় পুরোপুরি ছাত্র বা ছাত্রীটির ঘাড়ে চাপানো হয়। মনে করা হয়, কিছু ছেলেমেয়ে পাস করবে, কিছু ছেলেমেয়ে ফেল করবে— এটা একটা নিয়তিনির্দিষ্ট স্বাভাবিক ঘটনা, এতে স্কুল, সমাজ, রাষ্ট্র কারও কিছু করার নেই। ফেল করাটা একটা বৈধ ব্যাপার। যত নজর পাসওয়ালাদের দিকে, সাফল্যের দিকে। ফেলদের নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ওটা ওদের বা ওদের অভিভাবকদের দায়। আয় ভাই, আমরা সবাই ওদের কথা ভুলে থাকি।

ভারতে (নাকি উপহাদেশে) পাস-ফেল প্রথা উঠে গিয়েছিল কেন? ইষ্টনেস্কার তৈলায় আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মনে হয়েছিল স্কুলে বেশি ছাত্র, বিশেষত মেয়েরা, আসছে না, যারা আসছে তারাও টিকে থাকছে না। কাজেই বিপুল নিরক্ষরতা-কলঙ্কিত ভারত রাষ্ট্রের আসল কাজ ছেলেমেয়েদের স্কুলে এনে আটকে রাখা। তাবুন একবার, শিক্ষা দেয়া নয়, স্কুলে যেমন-তেমন করে হোক, আটকে রাখা। যেন স্কুলে রসে, থাকলেই ছেলেমেয়ে আপনা থেকে লেখাপড়া শিখে যাবে।

ওপনিবেশিক যুগ থেকেই পরীক্ষা স্কুলপারটার একটা নেতিবাচক জুজুবুড়ির চেহারা তৈরি করা হয়েছিল, ধরে নেয়া হয়েছিল, ফেল করার ভয়েই অনেকে স্কুলে আসে না বা ফেল করে বলে স্কুল ছেড়ে দেয়। তাই তুলে দাও ফেল ব্যবস্থা, সেই লক্ষ্যে একই মুদ্রার ওপিঠ পাস ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েগুলো স্কুলে গম্বুক। মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করছি, তারও একটা প্রবল টান তৈরি হবে পরিবর্তন। বাস, কাম হুঁসিল! আর কী চাই? ভারতের

শিক্ষা এবার লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাবে। এগিয়ে যে যাননি তারও ছবিটা স্পষ্ট। ক্লাস ফাইভে এখনও একশ'জনের মধ্যে পঞ্চাশজন স্কুল ছেড়ে দেয়। বিকল্প ব্যবস্থা যে ছিল না, তা নয়। ক্লাসে ক্লাসে ধারাবাহিক মূল্যায়ন। সেটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায় ছিল। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারাই সবচেয়ে বেশি করে জানেন, সেই ব্যবস্থা নিজেই 'ফেল' করেছে। শিক্ষক ও ছাত্রের উভয় পক্ষের বিপুল অনুপস্থিতি, ক্লাসঘরে ছাত্রছাত্রীর অতিপ্রাচুর্য ইত্যাদি এমন ব্যবস্থার



শুধু পাস-ফেল ফিরিয়ে আনলেই কি আসল 'শিক্ষাদান' শুরু হবে? এই অবিশ্বাসীর তো সন্দেহ ঘোচে না। ফেল যারা করবে তাদের কি ওইটাই শেষ নিয়তি হবে, তাদের সম্বন্ধে আর আমাদের ভাবার কোনো দায় নেই? রাষ্ট্র তাদের বিশেষ শিক্ষাদানের দায় নেবে না? আমাদের রাষ্ট্র যে 'কল্যাণমূলক' রাষ্ট্র? সে তার ভাবী নাগরিকদের এরকম চির ব্যবস্থায় নিষ্কেপ করে নিশ্চিত থাকবে? একশ', কখনও বা আড়াইশ'জনের ক্লাসে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা ছুঁয়ে দিয়ে বলবে, যা পার করো?

সহায়ক নয়। তাই যে শিক্ষককেই জিজ্ঞেস করি, তিনিই বলেন, ক্লাস ফোর-ফাইভ-সিক্স-সেভেন-এইটে ('প্রারম্ভিক' বা এলিমেন্টারি পর্যায়ের শেখদিকের ক্লাসগুলোতে) পড়ানোই কঠিন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, কারণ ক্লাসে ছেলেমেয়েরা এক পর্যায়ে নয়। কারও অক্ষরজ্ঞান সম্পূর্ণ নয়, কারও অঙ্কের দক্ষতা তৈরি হয়নি, কারও অন্য জ্ঞানের ভিত্তি দুর্বল থেকে গেছে। সে ক্ষেত্রে কোন ছাত্রগোষ্ঠীর দিকে লক্ষ্য করে পড়াবেন শিক্ষক-শিক্ষিকা?

যারা যারা প্রত্যাশিত মানের তলায় আছে তাদের দিকে? তাহলে তো যারা এগিয়ে গেছে তাদের প্রতি অবিচার হবে। আবার এগিয়ে থাকাদের লক্ষ্য করলে যারা পিছিয়ে আছে তারা পিছিয়েই যাবে, আরও পিছিয়ে। এ অবস্থায় শহরের অনেক সচেতন আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক তাদের সন্তানদের টিউশনের ব্যবস্থা করেন বা কোচিংয়ে দেন। কিন্তু টিউটর তাদের গোড়ার দুর্বলতা সারানোর ব্যবস্থা না করে ওই ক্লাসের পড়া মুখস্থ করিয়ে দেন। এমন নয় যে, কোনো অভিভাবক ভাবেন না টেনেটনে ক্লাস

যেমন একটা কন্ট্রের দিক, তেমনি গ্রামের নিরক্ষর অভিভাবকরাও প্রশ্ন করছেন, ছেলেমেয়েরা 'শিখছে' কতটা? সারাক্ষণ স্কুলে থাকা তাদের দেহে-মনে কতটা সম্পদবান করে তুলছে? এটা হয়তো একটা ভালো লক্ষণ যে, অল্প শিখে, অনেকটা না শিখে শুধু শুধু পাস করে যাওয়াতে তৃপ্ত ও নিশ্চিত হওয়ার মতো অভিভাবকের সংখ্যা ক্রমে কমছে।

যারা পাস-ফেলের ব্যবস্থা তুলে দিয়েছিলেন, তাদের মনে সম্ভবত এই দেশপ্রেমসিক্ত সদিচ্ছা ছিল যে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে এসে সময় কাটাক, সেটাই একটা শিক্ষা। কিন্তু ক্লাসঘরে কতটা 'শিক্ষাদান' চলছে, তাতে কে এগিয়ে যাচ্ছে, কে পিছিয়ে থাকছে (এরকম হতেই পারে এই অসম বিকাশের দেশে), যে পিছিয়ে যাচ্ছে তার ব্যাপারে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা— এই নজরদারি কি তারা করেছিলেন? ছেলেমেয়েদের স্কুলে আটকে রাখাটাই যথেষ্ট নয়, আসল কাজটা যে তাদের শিক্ষা দিয়ে জীবনের ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলা, সেই 'তুচ্ছ' ব্যাপারটা সম্ভবত তাদের চোখের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু শুধু পাস-ফেল ফিরিয়ে আনলেই কি আসল 'শিক্ষাদান' শুরু হবে? এই অবিশ্বাসীর তো সন্দেহ ঘোচে না। ফেল যারা করবে তাদের কি ওইটাই শেষ নিয়তি হবে, তাদের সম্বন্ধে আর আমাদের ভাবার কোনো দায় নেই? রাষ্ট্র তাদের বিশেষ শিক্ষাদানের দায় নেবে না? আমাদের রাষ্ট্র যে 'কল্যাণমূলক' রাষ্ট্র? সে তার ভাবী নাগরিকদের এরকম চির ব্যবস্থায় নিষ্কেপ করে নিশ্চিত থাকবে? একশ', কখনও বা আড়াইশ'জনের ক্লাসে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা ছুঁয়ে দিয়ে বলবে, যা পার করো?

এটা নিয়ে শিক্ষা-সম্মালক এবং শিক্ষাবিদ— সবাইই মস্তিষ্ক বাড় তোলা দরকার। এমন কোনো রাস্তা কি নেই যাতে পরীক্ষার ওপর থেকে ভয়ের মুখোশটা খুলে নেয়া যায়? পরীক্ষাটাকে একটা উৎসবের চেহারা দেয়া যায়? তাবুন, সবাই মিলে তাবুন। কথাটা যত অলীক আর অবাস্তব মনে হচ্ছে ততটা না-ও হতে পারে। শিশুদের পাঠ্যপুস্তক চিত্তাকর্ষক হচ্ছে-দিন দিন, পাঠ্যপুস্তক ফ্রেইরে জেনে বা না জেনে ক্লাসে পড়ানোর পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্যে শিক্ষকের ছবিটি অধিকাংশ ক্লাসেই অন্তর্ধান করেছে— শুধু পরীক্ষাটাই রাক্ষসের চেহারা নিয়ে থাকবে? আরেকটা কথা। কথাটা শুধুই নয়, অনেকের কানে খুব রক্তিকর লাগবে না। পরীক্ষা মানেই আরও বৈচিত্র্য ব্যাপক আর লাজজনক গণটোকাটুকির ব্যবস্থাপনা— এই অভিশপ্ত ভবিতব্য থেকে যেন আমরা সব শিশুকে রক্ষা করতে পারি।

পবিত্র সরকার : নাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা; লেখক